আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: রংপুর
জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যাপক রেজা শাহ তৌফিকুর রহমান, (সভাপতি) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
২. মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, দ্য ডেইলি স্টার
৩. এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক, চেয়ারম্যান, রংপুর পৌরসভা
৪. মোস্তফা আজাদ চৌধুরী, সভাপতি, চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর
৫. মারহামাতুননেছা, সভানেত্রী, মহিলা পরিষদ, রংপুর
৬. সদরুল আলম দুলু, সভাপতি, রংপুর প্রেসক্লাব
৭. মফিজুল ইসলাম মান্টু, সহ-সভাপতি, রংপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ
৮. ইমরুল কায়েস, পরিচালক, আরডিআরএস
৯. অ্যাডভোকেট এম এ বাশার টিপু, সহ-সভাপতি, বেগম রোকেয়া ফোরাম
১০. মুকুল মোস্তাফিজ, সভাপতি, সুজন ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক অটল
১১. হাসনহেনা রোজী, শহীদ পরিবার সদস্য
১২. ডা. মালা, গাইনী বিশেষজ্ঞ, রংপুর মেডিকেল কলেজ
১৩. অ্যাডভোকেট শামীমা আখতার, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
১৪. মো. ইয়াকুব আলী, উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, বাঁধন–একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন
১৫. অ্যাডভোকেট হোসনে আরা ডালিয়া, সভাপতি, রংপুর থিয়েটার
১৬. মকসুদার রহমান মুকুল, সাংস্কৃতিক কর্মী
১৭. নাসিমা আক্তার, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মাহিগঞ্জ কলেজ, রংপুর
১৮. মো. রেজাউল করিম রাজু, ছাত্র
১৯. হীরা হক, সাবেক কমিশনার, রংপুর পৌরসভা
২০. ফিরোজ ফারুক, সভাপিত, প্রথম আলো বন্ধুসভা, রংপুর
২১. অ্যাডভোকেট চৌধুরী নার্গিস আক্তার বানু, গাইবান্ধা বার অ্যাসোসিয়েশন
২২. অরূপ সরকার, সভাপতি, রংপুর শহর শাখা, ছাত্রমৈত্রী
২৩. লুবনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরডিআরএস
২৪. লায়লা রহমান কবির, সাবেক সভাপতি, এমসিসিআই ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেদারপুর টি কোম্পানি লিমিটেড ও সহ-আহ্বায়ক, নাগরিক কমিটি-২০০৬
২৫. অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান, উপাধ্যক্ষ, আহম্মদউদ্দিন শাহ কলেজ, গাইবান্ধা
২৬. ময়নুল ইসলাম, আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি (টিআইবি), লালমনিরহাট
২৭. অ্যাডভোকেট রোখসানা আনজুম লিজা, সভাপতি, প্রথম আলো বন্ধুসভা, নীলফামারী
২৮. মোহাম্মদ আফজাল, কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য, গণতন্ত্রী পার্টি ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
২৯. মোয়াজ্জেম হোসেন লাবলু, সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক লীগ রংপুর জেলা শাখা
৩০. মো. সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সাধারণ সম্পাদক, জাসাস
৩১. আব্দুল কুদ্দুস, আহ্বায়ক, বাসদ, রংপুর
৩২. নজরুল ইসলাম হক্কানী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওয়ার্কার্স পার্টি
৩৩. ডা. একারামুল হোসেন স্বপন, সভাপতি, জেলা জাসদ, রংপুর
৩৪. রোজী রহমান, সাধারণ সম্পাদক, মহিলা আওয়ামী লীগ
৩৫. সৈয়দ নূর আহমেদ টুলু, সহ-সভাপতি, জেলা জাতীয় পার্টি, রংপুর
৩৬. আশরাফ হোসেন বড়দা, সহ-সভাপতি, জেলা বিএনপি, রংপুর
৩৭. এম হাফিজউদ্দিন খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও প্রাক্তন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল ও সদস্য, নাগরিক কমিটি-২০০৬
৩৮. অ্যাডভোকেট ময়জুল ইসলাম ময়েজ, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, লালমনিরহাট
৩৯. প্রদীপ কুমার গোস্বামী, সভাপতি, মিঠাপুকুর প্রেসক্লাব, রংপুর
৪০. রশিদ বাবু, সাধারণ সম্পাদক, রংপুর প্রেসক্লাব
৪১. মানিক সরকার মানিক, স্টাফ রিপোর্টার, জনকণ্ঠ
৪২. মো. সালেকুজ্জামান সালেক, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক দিনকাল
৪৩. ওয়াদুদ আলী, নিজস্ব সংবাদদাতা দৈনিক ইত্তেফাক ও রংপুর প্রতিনিধি চ্যানেল ওয়ান

৪৪. সালমা বেগম, কবি ও লেখক, অভিযাত্রিক সাহিত্য সংসদ, রংপুর
৪৫. পিন্টু সাহা, সাংস্কৃতিক কর্মী রংপুর ।
৪৬. মো. এন্তাজুর রহমান, অধ্যক্ষ, শেখ শফিউদ্দিন কমার্স কলেজ, লালমনিরহাট
৪৭. আমিরুল হায়াত আহমেদ, লালমনিরহাট
৪৮. মো. মাহবুবার রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সমাধান সংস্থা, রংপুর
৪৯. রেজিনা সাফরীন, ভাইস প্রিন্সিপাল, আর্কেডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৫০. মো. আবুল কালাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা দোকান মালিক সমিতি
৫১. মো. ফরহাদ হোসেন রিপন, সদস্য, রংপুর উন্নয়ন পরিষদ
৫২. তপন চ্যাটার্জী, ছাত্র, কারমাইকেল কলেজ
৫৩. জহুরুল কাইয়ুম, সভাপতি, উদীচী, গাইবান্ধা
৫৪. লাভলী ইয়াসমিন রত্না, তথ্য সহকারী, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সহায়তা কেন্দ্র
৫৫. মো. নজরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, ইনসাফ, রংপুর
৫৬. মো. সোহেল রানা, ছাত্র
৫৭. মো. শরিফুল আলম, ইন্সট্রাক্টর, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর
৫৮. অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম মুকুল, বার ভবন সম্পাদক, আইনজীবী সমিতি রংপুর
৫৯. সোহেল এলাহী, কৃষিকর্মী
৬০. বনমালী পাল, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
৬১. মো. আশ্‌রাফুল আলম আল্‌-আমীন, সাধারণ সম্পাদক উদীচী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
৬২. ডা. মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম, সভাপতি, বিপিএমপিএ
৬৩. মোজাহার হোসেন, উপাধ্যক্ষ, রংপুর সরকারি কলেজ
৬৪. কৃষিবিদ আহসান হাবিব, মীরবাগ ডিগ্রি কলেজ, কাউনিয়া, রংপুর
৬৫. মো. আব্দুল ওয়াহেদ মিঞা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, রংপুর
৬৬. ক্যাপ্টেন আজিজুল হক, বীরপ্রতীক
৬৭. মো. নুর ইসলাম, পেশাজীবী
৬৮. অ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ চৌধুরী, আইনজীবী
৬৯. হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি, রংপুর
৭০. আনোয়ার হোসেন বাবলু, আহ্বায়ক, বাসদ, রংপুর
৭১. মো. আরশাদ হারুন, সভাপতি, গণতন্ত্রী পার্টি, রংপুর
৭২. আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি, গণফোরাম
৭৩. মো. তারেক বাপ্পী, সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় ছাত্র ঐক্য, রংপুর
৭৪. অ্যাডভোকেট মো. আবুল কালাম আজাদ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, গণতন্ত্রী পার্টি
৭৫. হাসনা চৌধুরী, সম্পাদক, মহিলা পরিষদ, রংপুর
৭৬. ডা. জাকি, লালমনিরহাট
৭৭. সৈয়দ মাহবুবার রহমান হীরক, কর্মজীবী নারী, রংপুর ফিল্ড অফিস
৭৮. আব্দুন নূর দুলাল, সাবেক ভিপি, রংপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদ
৭৯. মো. শাহজাদা, ছাত্র, সরকারি কারমাইকেল কলেজ
৮০. মো. রবিউজ্জামান পলাশ, সহকারী শিক্ষক, লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
৮১. অ্যাডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক, সভাপতি, পদাতিক, রংপুর
৮২. লিটন পারভেজ মান্না, সদস্য, সাউন্ড টাচ্‌, রংপুর
৮৩. মোশফেকা রাজ্জাক, আইভিএস, রংপুর
৮৪. মো. রেজাউল হক, শিক্ষক, বেগম রোকেয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রংপুর
৮৫. রাজেশ অধিকারী, সমন্বয়কারী, সুশাসনের জন্য নাগরিক, রংপুর
৮৬. মানিক চাঁদ, সদস্য, অভিযাত্রিক
৮৭. শফিকুল ইসলাম, প্রভাষক ইংরেজি বিভাগ, রংপুর সরকারি কলেজ
৮৮. গৌতম রায়, আহ্বায়ক, সামাজিক সংগঠন-পরিবর্তনধারা
৮৯. আকবর হোসেন, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক, রংপুর
৯০. মো. নূরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার এডুকেশন
৯১. সোহেল মাহমুদ

৯২. অ্যাডভাকেট মুনীর চৌধুরী, মানবাধিকার কর্মী, রংপুর
৯৩. সিরাজুর ইসলাম সিরাজ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সারথি একাডেমি, রংপুর
৯৪. মুন্নি আক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, জানিপপ
৯৫. মোস্তফা কামাল, জানিপপ
৯৬. রকিবুল হাসান, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯৭. মো. হফিজুর রহমান লাভলু, সদস্য, দ্য ডেইলি স্টার রিডার্স ক্লাব
৯৮. মো. আল মাহমুদ কবির রোমেল, প্রথম আলো বন্ধুসভা
৯৯. মো. সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, জেলা দোকান মালিক সমিতি
১০০. অ্যাডভোকেট আ ই মো. সারওয়ার-উল-আলম, সাবেক সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনা পর্ব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আইর পক্ষ থেকে রংপুরে আজকের এ নাগরিক সংলাপে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, আজ থেকে প্রায় চার মাস আগে আমরা ঢাকায় একটি জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি কর্মসূচি শুরু করি। তবে বলা দরকার যে এ উদ্যোগের সূত্রপাত আরও অনেক আগেই ঘটে। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার অনুরূপ সংলাপ দেশব্যাপী আয়োজন করেছিল।
এ মুহূর্তে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি কোনো নীতি কাঠামো বিরাজ করছে ১না। আগে পাঁচ বছরের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল। সেটা গত চার-পাঁচ বছর আর প্রণয়ন হয় না। তার বদলে আমরা একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র পেয়েছি। সেটা তিন বছরের আবর্তনমূলক। এটার বাস্তবায়নও এ মুহূর্তে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে মানুষ দেশের প্রতি কী চিন্তা করবে, আকাঙ্ক্ষা করবে সেটা খুব পরিষ্কার নয়। মধ্যমেয়াদি চিন্তা যদি দেশের সামনে, জাতির সামনে তুলে ধরতে পারি সেটা অনেক বেশি উপকারী হবে। আমরা অনেক বিতর্ক করলাম যে কত সময় ধরে, কী সময়ের ভেতর আমরা এটাকে দেখব। তখন আমাদের কাছে মনে হলো, এটা ১৫ বছরের সময়কাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশে নতুন গণতন্ত্রের যাত্রা চলছে। এ সময়ের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। সেটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য একদিকে, রপ্তানিশিল্প আরেকদিকে। কৃষি আরেকদিকে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অর্জন আছে। কিন্তু একই সঙ্গে এ সময়ে আমরা দেখেছি যে এ অর্জনের ভাগীদার সবই সমানভাবে হয়নি। গরিব মানুষের যতখানি পাওয়ার কথা ছিল সেভাবে পায়নি। উত্তরবঙ্গে মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল যেভাবে পাওয়ার কথা ছিল সেভাবে পায়নি। নদীভাঙনের দেশে যারা, তারা সেভাবে পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে পাওয়ার কথা ছিল সেভাবে পায়নি। যারা উপকূল অঞ্চলে বাস তারা পায়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভেতর এখনো প্রচুর জনগোষ্ঠী বা এলাকা রয়ে গেছে যারা এখনো অনগ্রসর। বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বা তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। আমরা তখন চিন্তা করলাম, এভাবে যদি দেশটা এগোয় আগামী ১৫ বছর পরে কী হবে। স্বাভাবিক গতিতে কী হবে সেটা দেখার একটি সুযোগ আছে। কেন ১৫ বছর পরে? কারণ ১৬ বছর পর বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার অর্ধশতক পূর্ণ করবে। আমাদের কাছে মনে হলো যেভাবে দেশ ১৫ বছরে এগিয়েছে সেভাবে যদি আগামী ১৫ বছর এগোয় তাহলে পরিস্থিতি কী হবে। অগ্রগতি হয়েছে আমি বলছি। কিন্তু এভাবে উন্নতি করতে থাকলে বাংলাদেশ ১৫ বছর পরও একটি মধ্য আয়ের দেশে কিন্তু পরিণত নাও হতে পারে। সব বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এটা এগোতে পারছে না তার মূল কারণ হলো দেশের ভেতর অনেক ক্ষেত্রেই অদক্ষতা আছে। অপচয় আছে। দুর্নীতি আছে। এটার মূল কারণ সুশাসনের অভাব। সুশাসনের অভাব থাকলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় না। আমাদের মনে হলো নির্বাচনকে সামনে রেখে সুশাসনের বিষয়টি সামনে আনতে পারি। বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান সুশাসনকে নিশ্চিত করতে পারে–যেমন স্থানীয় সরকার, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন। আমাদের প্রশাসন এবং সংসদও বটে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেখানে ব্যক্তি কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন ব্যক্তি অনেক বেশি আচার-আচরণ করে যেটা তার স্বেচ্ছাধীন থাকে।
আপনাদের কাছে দুটো জিনিস দিয়েছি আপানারা দেখবেন। একটি গোলাপি রঙের কাগজ আছে। এটার ভেতর নির্বাচন সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কার। দুটোর ভেতর কিন্তু ভিন্ন মতামত আছে। লক্ষ করবেন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্যটা কোথায়। তারা যখনই সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেন, শুধু নির্বাচনী সংস্কারের কথা বলেন। ভোটার, রিটার্নিং অফিসার এসব নিয়ে বলেন। আমরা বলি শুধু এগুলো করলে হবে না, এর সঙ্গে কালো টাকার বিষয়টি আনতে হবে। তা না হলে ঠিকমতো নির্বাচন হবে না। পাশপাশি আমরা এটাও বলি, রাজনৈতিক দলগুলোর

যদি সংস্কার না হয় তাহলে নির্বাচন সংস্কার করেও হবে না। কারণ নির্বাচন পদ্ধতি যতই সুষ্ঠু হোক দলগুলো ভেতর থেকে যদি সৎ, ত্যাগী নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে মনোনয়ন না পান তাহলে ওই ভালো পদ্ধতিতে খারাপ লোকই ঘুরেফিরে আসতে থাকবে। রাজনৈতিক সংস্কারের কথা আমরা বলছি। ভোটে যোগ্য প্রার্থী চিনব কেমন করে। এসব বিষয়েই আপনাদের মতামত আহ্বান করব।

আলোচনা পর্ব

মাহফুজ আনাম

এখন নির্বাচন কমিশন যে ধরনের গড়িমসি করুক না কেন ভোটার হওয়ার অধিকার আমার আছে। কেউ নিতে পারবে না। তাই আমি প্রথমে যে আহ্বান জানাব, সত্যিকার অর্থে আমাদের এটার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে। পেছনে বসে থাকলে কেউ আপনার হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে না। স্বাধীনতা যদি থাকে সেটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। আপনাকে গিয়ে আপনার দাবি যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত সেটাকে কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে ভোটার হতে হবে। আমি আহ্বান করব, যে যেখানে আছেন যেভাবেই আছেন না কেন আপনি যান যত কষ্টই হোক না কেন। আপনাকে ভোটার যেন করা হয়। আমি এও প্রস্তাব দেব, বিভিন্ন জায়গায় যেন সুষ্ঠু ভোটার লিস্ট প্রণয়ন কমিটি তৈরি করা হয়। পুরো বাংলাদেশেই যেন দাঁড়িয়ে যায় যে আমি ভোটার হব। আমরা এমন সরকার চাইব, যে জনগণের স্বার্থ সবসময় দেখবে। এখন একটি কথা এসেছে। জনগণের স্বার্থ সরকার দেখছে কি না। এটা দেখার জন্য রাজনৈতিক দল আছে। সার্বক্ষণিক রাজনীতি করেন তারাই তো আছেন। আমি সাংবাদিক, আপনি চিকিৎসক আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা আমাদের কাজ করব। আমি মনে করি এ ধরনের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্র হরণের বক্তব্য। কেননা আমি ডাক্তার হিসেবে কোনো রাজনীতিবিদের কাজে বাধা দিচ্ছি না। একজন সাংবাদিক হিসেবে আইনজীবীর কাজে বাধা দিচ্ছি না। শিক্ষক হিসেবে আরেকজনের কাজে যাচ্ছি না। কিন্তু যিনি দেশ পরিচালনা করেন তিনি তো সবার মধ্যে আছেন। আমি যা-ই করি না কেন আমি তো আমার সরকারের নীতি দ্বারা আবদ্ধ। সেটাই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো ভালো জিনিস। তার মানে আমরা যে যেখানে থাকি না কেন সরকারের সম্পর্কে কথা বলা, রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলা আমাদের একেবারে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন। নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার আছে। আমার সরকার, রাজনীতিবিদ কে হবেন, কীভাবে হবেন, কীভাবে চলবেন–সব অধিকার আমার আছে। যে বলে আমার এ অধিকার নেই সে আমার অধিকার বঞ্চিত করে। আমি বলব আমাদের এ উদ্যোগ গণতন্ত্রের উদ্যোগ। গণতন্ত্রকে বলীয়ান করার উদ্যোগ। দেশকে সুপরিচালিত করার উদ্যোগ।

এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক

নির্বাচনে যারা নমিনেশন নিতে আসছে তারা বড় বড় শিল্পপতি, কালো টাকার মালিক। যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে তাদের স্থান এখানে থাকছে না। রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের অবস্থান থাকছে না। ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদেরা তাদের ব্যবসা গোছানোর চেষ্টা করছেন। তারা জনগণের কোনো কাজে আসছে না। যোগ্য রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টারিয়ান হতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। জনগণের জন্য যার দরজা খোলা থাকবে, এ রকম লোককে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে আনা উচিত বলে আমি মনে করি।

মোস্তফা আজাদ চৌধুরী

দেশ ও জাতি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ কারণে উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সুশীল সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে। কারণ দেশবাসীর পক্ষে বলার অধিকার তাদেরও আছে। প্রার্থী মনোনয়নে কালো টাকার মালিক-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তারা যে কথা বলছে তা জনগণেরই কথা। এটা জনগণকে আশান্বিত করেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচন, নেতৃত্বের প্রয়াস, নেতার জবাবদিহিতা, দলের সদস্যপদ বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোনয়ন পাওয়ার নীতিমালা, নির্বাচনী এলাকায় দলের কাঠামো, তার ক্ষমতা, মনোনয়ন লাভের নীতিমালা, তহবিল-স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের কথা বললেও আমরা দলগুলোয় গণতন্ত্রের চর্চা দেখি না। আমার মনে পড়ে না, কোনো দলের সভাপতি বা মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে এসেছেন।

এটা সর্বজনসত্য যে বড় দলগুলো মোটা অঙ্কের টাকা ডোনেশন নিয়ে মনোনয়ন দিচ্ছে। সেদিনই তো তাকে দুর্নীতি করার ছাড়পত্র দেওয়া হলো। আমরা মনে করি কোনো ব্যক্তির যদি মনোনয়ন নিতে হয় তাহলে কমপক্ষে পাঁচ বছরের দলের সদস্যপদ থাকতে হবে। এরপরই সে যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ধরনের উদ্যোগ সবসময় সফল হবে। তবে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যত দিন পর্যন্ত ৯০ ভাগ মানুষ শিক্ষিত না হবে তত দিন ভোট কেনাবেচা চলবেই।

মারহামাতুননেছা

যেসব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে তারা অনেক কিছুই জানে না। ফলে শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। এর প্রতিফলন আমরা পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে পাচ্ছি। অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে একজনও এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। গ্রামে নারী নির্যাতনের মামলাগুলো একশ্রেণীর দালালেরা কিনে নেয়। তারা নির্যাতিত নারীকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে দেনমোহর খোরপোষবাবদ প্রাপ্য সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করে। এটা করতে পারে এ কারণে যে নির্যাতিত নারীর মামলা করার আর্থিক সামর্থ্য নেই। এ ছাড়া রয়েছে নারী পাচার, নারী শ্রমিকের শোষণ, নারীর কর্মহীনতা–এ ধরনের হাজারো সমস্যা। এ থেকে মুক্তির জন্য আমরা চাই স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিত্ব। নির্বাচিত নারীদের যথাযথ ক্ষমতায়ন।

সদরুল আলম দুলু

আমরা একমত, যে রাজনীতি দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে সে রাজনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা পরিবর্তন চাই এ কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি মনে করি আমাদের দেশের মানুষ দুটি বৃহৎ দলে বিভক্ত। তাদের নেতৃত্বের কাছে আমাদের মতামত না পৌঁছালে আমাদের এ উদ্যোগ সফল হবে বলে মনে করি না। আরেকটা হতে পারে মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। আমি মনে করি, এসব নাগরিকের মতামত নিয়ে বৃহৎ যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসা প্রয়োজন।

মফিজুল ইসলাম মান্টু

আজকে বিদগ্ধ সুশলী সমাজ দেশকে নিয়ে চিন্তা করছে। যারা এ উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের প্রতি বাংলাদেশের বড় দলগুলো কটাক্ষ করছে, তাচ্ছিল্য করছে, আক্রমণ করতে যাচ্ছে এ রকম একটি পরিস্থিতি আজকে বিরাজ করছে। আমি একজন বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে এর প্রতিবাদ জানাতে চাই। ক্ষোভ প্রকাশ করতে চাই। আজকে দেশের শান্তি সমৃদ্ধি শিক্ষা অগ্রগতি সব একটা পঙ্কিল আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা চাই সুশাসন, জনপ্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। আজকের ছাত্রনীতির দিকে তাকিয়ে আমি খুব হতাশ হচ্ছি। যে ছাত্ররাজনীতি পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে সে ছাত্ররাজনীতি আজকে টেন্ডারবাজি সন্ত্রাসী রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। একে কলুষমুক্ত করতে হবে। ছাত্ররাজনীতিকে নিয়ে আসতে হবে সে প্রকৃত ধারায় যে ধারা বাংলাদেশ নির্মাণ করেছিল। সিপিডির পরামর্শের প্রতি আমারা সমর্থন ব্যক্ত করছি। না ভোটের পক্ষে জোর গলায় বলছি।

ইমরুল কায়েস

একটি রাজনৈতিক দল বিরোধী দল হিসেবে যে আচরণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে, সে দলটি যখন ক্ষমতায় যায় তার মধ্যে রাজনৈতিক আচরণের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মিডিয়ার প্রতি এ আবেদনটি রাখব যেন তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ায় মিডিয়া পর্যাপ্ত ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে কলো টাকা সাদা করার যে বিষয়টি বেশি আলোচিত হচ্ছে। কারা এ কালো টাকা সাদা করল। এ তথ্যটা জনগণের কাছে অন্তত নির্বাচনের আগেই উন্মোচিত হোক। একজন রাজনৈতিক নেতা দুবারের বেশ নির্বাচিত হবেন না। এর পরে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসার সুযোগ করে দিয়ে তারা রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন।

অ্যাডভোকেট এম এ বাশার টিপু

যারা গণতন্ত্র বুঝছে না। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের আলোর পথে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমরা তাদের প্রতারিত করছি। তাদের ব্যবহার করছি। জনগণের জন্য যে গণতন্ত্র আমরা প্রত্যাশা করি সে গণতন্ত্র কোথায়? অসৎ ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে চাই। বিশেষ করে রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র, স্বজনতন্ত্র ও রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। সুশীল সমাজ বিশাল অপশক্তির বিরুদ্ধে নেমেছে। আমাদের অন্য কোনো ক্ষমতা নেই। আমাদের আছে মানসিক শক্তি, আত্মার শক্তি। আমাদের মধ্যে রয়েছে শুদ্ধতা। একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও জবাবদিহিমূলক অবস্থা আমরা তৈরি করতে চাই। এ শক্তির সঙ্গে সারা দেশের মানুষ আছে বলে আমরা মনে করি।

মুকুল মোস্তাফিজ

স্বাধীনতার পর থেকে শুধু রাজনীতিবিদদেরই নয়, প্রশাসনের যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের সম্পদের হিসাব নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ রাজনীতির পালা পরিবর্তনের পরই সে রাজনীতিবিদ জেলে চলে যান। সচিব আবার সে

চেহারায় স্বপদে ফিরে আসেন অথবা আরও উন্নতি হয়। আজকে রাজনীতি দখল হয়ে গেছে। সংসদে ৫৮ শতাংশ মানুষ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীরা তো রাজনীতিবিদদের কাছে যায় না। রাজনীতিবিদেরাই তাদের কাছে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যারা আদর্শিক রাজনীতি করে তাদের মানুষ আজকে করুণা করে। অতীতে দেখতাম আদর্শভিত্তিক কোনো ব্যক্তি থাকলে গর্ব করে বলতে শুনতাম অমুক এলাকায় ভালো লোক থাকেন। আর এখন যারা আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করেন মানুষ তাদের করুণা করে বলে ওই এলাকায় একজন বোকা লোক থাকে।

লায়লা রহমান কবির

গত ১৫ বছরে আমাদের বড় অর্জন আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধানকে বলবৎ রাখতে সক্ষম হয়েছি। সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি। এ জন্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে প্রধান দলগুলো আন্তরিক প্রশংসার অধিকারী বলে আমি মনে করি। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে আমরা সফল হতে পারিনি। সেটা হলো গণতন্ত্রের চর্চা। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ, সরকার এবং জুডিশিয়ারি–এ তিনটি প্রতিষ্ঠান আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্তম্ভস্বরূপ। এর মধ্যে ভারসাম্য থাকা চাই। কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য তা অপরিহার্য। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। অথচ এ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারের সময় বিরোধী দল অনুপস্থিত থেকেছে। যে জন্য সংসদ অকার্যকর হয়ে গেছে। অবশ্য বিরোধী দলকে সংসদে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায়। এ দায়িত্ব কোনো সরকারই সঠিকভাবে পালন করেনি। জুডিশিয়ারি শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করে, সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ও রক্ষা করে এবং সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তাদের ভূমিকা রাখার ক্ষমতা সমাজে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে এখন সব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সরকার। এই বিশাল ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। এ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার জন্য যেখানেই সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা আছে সেখানেই দলীয়করণ হয়েছে। এ অবস্থার অবসান তখনই যখন ভোটার নিজে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। এবং ভোট দেওয়ার সময় চিন্তাভাবনা করে তাকেই ভোট দেবে যে নাগরিক অধিকারকে রক্ষা করবে। যেহেতু ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যায় সেহেতু ভোটার যদি সচেতন হয় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে।

অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান

এখন যে দুটি রাজনৈতিক দল আছে বা জোট আছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কি সৎ ও যোগ্য রাজনীতিক নেই? আছে। কিন্তু তারা মনোনয়ন পাচ্ছেন না। নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছেন না। আমরা ওইখানে চাপ দিই না কেন। আরেকটি বিষয় জানা দরকার, আওয়ামী লীগ-বিএনপি যে-ই হোক না কেন ওরা মনোনয়ন দেওয়ার সিলেকশন করছে ঢাকায়। আমার সাজেশন হচ্ছে বড় দুই দলকে বলা এভাবে মনোনয়ন না দিয়ে তৃণমূলে যেসব নেতা-কর্মী আছে তারা সম্মেলন করুক। দরকার হলে ভোট দিক। গোপন ভোট দিয়ে বলুক আমাদের এলাকায় ওই লোকটিকে মনোনয়ন দেওয়া দরকার। টাকা-পয়সা থাকুক না থাকুক। লবিং না থাকুক। তাহলে আমার মনে হয় আমরা যাকে মনোনয়ন দেব তিনি হবেন জনগণের লোক। পাশাপাশি দরকার একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। যিনি সমগ্র দেশবাসীকে একচোখে এক রকমভাবে দেখতে পান। সংস্কারমুক্ত কি না। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে যা-ই হোক দেশ ও জাতির নেতা হতে দেওয়া যায় না। সর্বশেষ যে গুণটির কথা আমি বলব সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই তাকে কোনোভাবেই এখানে আসতে দেওয়া যাবে না।

ময়নুল ইসলাম

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতিটা কী তা আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যিনি সৎভাবে উপার্জন করছেন তিনি কি যোগ্য প্রার্থী? আবার একজন অসৎভাবে উপার্জন করছে। তিনি কি সৎ প্রার্থী। প্রশ্ন থাকল। যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতি মুহূর্তে মোবাইলে হুমকি। সময় দিয়ে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে আজকের এ আয়োজন। আমাদের নিরাপত্তার বিধান আমাদেরই করতে হবে। অসৎ মানুষগুলো রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে রাজনীতিকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। এ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

মোহাম্মদ আফজাল

গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজ কিন্তু আমরা ৩৫ বছরে প্রতিষ্ঠা করত পারিনি। সূচনায় কিছুটা অগ্রগতি হলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এখন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এ মুহূর্তে যে সরকার ক্ষমতায় আছে তার ফ্যাসিস্টপ্রবণতা অত্যন্ত বেশি। এ সরকারে একটি শরিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী এবং ফ্যাসিস্ট। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট দল। চারটি দলের মধ্যে একটির কথা বলব বিশেষ করে। আরও আছে। আরেকটি ধর্মদর্শী

দল। জামায়াতে ইসলামী এখনো বাংলাদেশকে মানে না। এখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে। তারাই এখন ক্ষমতাসীন। জেএমবি সৃষ্টি করেছে এরা। এবং এদের আন্তর্জাতিক মুরব্বি আছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে লাদেন সৃষ্টি হয়েছে ওই আল-কায়েদা, ওই মুজাহিদ বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদ-ফিহাদ সব। এখন একটু সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমেরিকার আশীর্বাদ যাদের ওপর আছে তাদেরই সহযোগিতায় এরা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আছে। সুতরাং এটা বাংলাদেশের জন্য বাঙালি জাতির জন্য মহাবিপদ। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের কর্তব্য এই অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এরা যেন কোনো অস্ত্র নিয়েও বোমা নিয়েও বের হতে সাহস না পায়। মানুষ যদি জেগে থাকে, জেগে যায় অস্ত্র বের করার সাহস পাবে না। যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়; এই যে চারটি সংস্থা এরা যেমন কাজ করছে তেমনি দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক দল, সামজিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন তারাও আন্দোলন করছে। ১৪ দলের পক্ষ থেকে কতগুলো সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তারা মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। সংস্কারের দাবি সরাসরি সিপিডি প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আই এবং তাদের নাগরিক কমিটি সুশীল সমাজ তারা সেভাবে না নিয়ে এলেও তারা এটার বিরুদ্ধে নয়। আমি মনে করি ১৪ দলের আন্দোলন অন্য সংস্থার আন্দোলন অন্যান্য দলের আন্দোলনের সঙ্গে এই যে চার সংগঠনের সচেতনতার আন্দোলন। এ আন্দোলনের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই। পরিপূরক মনে করি।

মোয়াজ্জেম হোসেন লাবলু

আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৫ বছর। আজকে কি আমরা বলতে পারব জাতীয়, জেলা বা অন্য নেতারা সত্য কথা বলেন, সত্য স্বীকার করেন। সৎ কোনো পরামর্শ দেন বা কোনো মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে ইলেকশন করেন। আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি টিভি সেন্টার এবং খবরের কাগজে একটি মিথ্যা খবর শুনে যাচ্ছি। সেটি হচ্ছে ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা র‍্যাবকে দেখে গুলিবর্ষণ করে এবং ক্রসফায়ারে মারা যায় অমুক সন্ত্রাসী। বাংলাদেশে একটি আইন আছে ঋণখেলাপীরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। কিন্তু তারা ভোট দিতে পারবে। এ রকম একটা আইন করা দরকার যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে, সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে তারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে কিন্তু প্রার্থী হতে পারবে না এমন আইন পাস করা দরকার। তাহলে রাজনীতি সন্ত্রাসমুক্ত হবে এটা বিশ্বাস আমার। যে ব্যক্তি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানেন না। তিনি একজন বিচারপতি ছিলেন। তার অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এটা আমরা আশা করতে পারি না।

মো. সিরাজুল ইসলাম সিরাজ

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবস্থানগত কারণে আমরা হরতাল দিয়ে বসলাম। হরতাল দিয়ে বললাম হরতাল আমার সাংবিধানিক অধিকার। বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক বা অন্য কোনো দল হোক তাদের সাংবিধানিক অধিকার। আমি নাগরকি। আমি রাস্তা দিয়ে চলব এটাও আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমার বাচ্চাকে আমি স্কুলে নিয়ে যাব এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দোকান খোলা রাখব, এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সেখানে আমাকে বোমা মারা হবে। আমার পয়সায় কেনা গাড়ি আমি চালাব, এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। সেটা রাস্তায় ভাঙচুর করা হবে। আমার সেই সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আঘাত হানছে যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সে যে দলেরই হোক তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে নাগরিক সমাজকে। আসুন আমরা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই। যে রাজনৈতিক দল করি না কেন, আপনাদের পাশে থাকব।

আব্দুল কুদ্দুস

এ দেশে চুরি, দুর্নীতি, লুটপাটের সঙ্গে একাডেমিক অর্থে যারা শিক্ষিত তারাই যুক্ত, গরিব মানুষ যুক্ত নয়। মহামতি কাল মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদের ঊষালগ্নে পুঁজিবাদ মানবজাতিকে অনেক কিছু দিয়েছে। এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকে তার ক্ষয়ের সময়। এ সমাজ পরিবর্তন ছাড়া, সমাজ পরিবর্তনের জন্য বাম প্রগতিশীল শক্তির বাইরে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। আমরা আপেক্ষিকভাবে সঠিক মনে করেছিলাম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে সংস্কারের কথাই আমরা বলি না কেন কোনো ব্যবস্থাই আমরা টিকাতে পারব না।

নজরুল ইসলাম হক্কানী

পলিটিক্স বিকামিং ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান। রাজনীতর দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। ব্যবসায়ী কালো টাকার মালিকদের হাতে রাজনীতি চলে গেছে। রাজনীতির প্রতি মানুষের বিশ্বাস-আস্থা হারিয়ে গেছে। মানুষ মনেই করে রাজনীতি দিয়ে মানুষের মঙ্গল হয় না। কিন্তু এ রাজনীতি আমরা সৃষ্টি করিনি। এখানে স্পষ্ট ভাষায় আছে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের কথা। আমরা শুধু রাজনীতিবিদেরাই স্বপ্ন দেখব আর বাইরের সমাজের মানুষ স্বপ্ন দেখবে না তা তো হয় না। নানা গোষ্ঠী স্বপ্ন দেখতে পারে। রাজনীতিবিদেরা সে স্বপ্ন এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। ঋণখেলাপি, দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানসহ অসদুপায়ে অর্জিত সব অর্থ-সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত করা হবে। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হবে। তাদের কোনোক্রমে রাজনৈতিক দলে গ্রহণ ও মনোনয়ন দেওয়া যাবে না। রাজনীতির দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস করে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির ধারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ডা. একারামুল হোসেন স্বপন

জাতীয় নির্বাচনে মনোয়ন নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে তখন স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা চলে আসে যে কাদের এ নির্বাচনে প্রার্থী করব। যোগ্য প্রার্থীর কথা বলা হয় কিন্তু নির্বাচন এলেই দেখা যায় বড় বড় রাজনৈতিক দল কিংবা ছোট দলই হোক না কেন যারা দেশ নিয়ন্ত্রণ করেন যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের মধ্যে কেমন যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কার কত বেশি টাকা আছে, পেশি শক্তি আছে তাদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। আমি মনে করি আজকে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব আছে। আমি স্বীকার করি আমরা যারা রাজনীতি করি গত ৩৫ বছরে অনেক ভুল রয়ে গেছে। অনেক ছোট-বড় ভুলের খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে। আজ নাগরিক সমাজসহ পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ আমরা নিজেদের সুশীল সমাজ বলে দাবি করি তাদের প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশকে একটি কার্যকারী গণতান্ত্রিক দেশ বানানোর চেষ্টা করতে হবে।

রোজী রহমান

আমি বলতে চাই এই সুপারিশমালাগুলোকে কি আইনে পরিণত করে এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কি না। আমরা নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে চাই যারা একনিষ্ঠভাবে রাজনীতিতে থাকবে। ওতপ্রোতভাবে রাজনীতিতে জড়িত থাকবেন। দরিদ্র মানুষের কথা বলবেন, জনগণের কথা বলবেন, দেশের উন্নয়নের কথা বলবেন, আপনার-আমার সবার কথা বলবেন, সৎ চরিত্রবান হবেন। আজকের এই সুশীল সমাজের বাইরে দিয়ে আমরা যারা বসে আছি শুধু তারাই সুশীল সমাজ নই। আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও সুশীল সমাজ আছে। আমরা তাদের মাধ্যমে এটাকে আরও প্রসারিত করতে চাই। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাবি জানাতে চাই আমরা যদি ২০০৭-এ সুষ্ঠু নির্বাচন জবাবাদিহমূলক প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে চাই তাহলে এ নির্বাচন কমিশনারসহ দুই সচিবের পদত্যাগ চাই।

সৈয়দ নূর আহমেদ টুলু

দেশের যে অবস্থা এটাতে কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমি আশাবাদী। আজ সিপিডি তার যেটকু সাধ্য সেটুকু সাধ্য নিয়ে নেমেছে। তারা বলছে, এ পথ গণতন্ত্রের। এ পথ দিয়ে জনগণ যাবে। এখানে কিছু মাসলম্যান, করাপটেড আমলা, কিছু অপদার্থ রাজনীতিবিদ হয়তো নষ্ট করতে পারে। এটিই পথ। নির্বাচনই পথ। নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সর্বস্তরের ইনস্টিটিউট চেয়ারম্যান থেকে ওপর পর্যন্ত নির্বাচন করতে হবে। উপজেলা প্রশাসনকে চেয়ারম্যানের অধীনে, জেলা প্রশাসনকে চেয়ারম্যানের অধীনে আনতে হবে। সংসদে জবাবাদিহি করতে হবে। একজন উপযুক্ত নির্বাচন কমিশনার দিতে হবে।

আশরাফ হোসেন বড়দা

স্ব-স্ব দায়িত্ব যদি আমরা সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারি তাহলে আমরা একটা রাস্তা দেখতে পারব। নাগরিক কমিটি সে রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে পারস্পরিক অবিশ্বাস আমাদের গোটা জাতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সুতরাং সেখান থেকে নাগরিক কমিটিকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসার মাধ্যমগুলো নাগরিক কমিটির কাছে বিদ্যমান। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনারা প্রতিফলিত করবেন আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে। যে দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন সে দায়িত্ব যদি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে আপনারা দেশকে গাইড করবেন। দুই নেত্রীকে বসতে হবে জনতার চাপে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যদি উদারনৈতিক মনোভাব দেখায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা সমাধান নিয়ে আসতে পারবেন। ২০০৭ সালের নির্বাচনই শুধু নয়, আমি অনুরোধ করব, আগামী সব নির্বাচনে–যে নির্বাচন আসুক শুধু পার্লামেন্ট নির্বাচন নয় স্থানীয় নির্বাচনেও আপনারা সক্রিয় থাকবেন। আমি তো মনে করি পার্লামেন্টের সদস্যদের একটা দায়িত্ব দেশের আইন প্রণয়ন আর বাকিটাই থাকবে স্থানীয় সরকারের। স্থানীয় সরকারকে এমনভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে যে স্থানীয় সংসদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে কাজ করে যেতে পারে।

এম হাফিজউদ্দিন খান

এখানে কাগজটি বিতরণ করা হয়েছে নির্বাচন সংস্কার আপনারা দেখেছেন। এখানে ৪১ দফা রয়ে গেছে। এটা অবশ্যই এক নির্বাচনের ব্যাপার নয়। এটা ঠিকই বলেছেন আপনারা। আরও নির্বাচন লাগবে। তবে সামনে যেহেতু নির্বাচন এগিয়ে এসেছে। অন্তত পক্ষে কয়েকটা কাজ যেন হয়। কালো টাকার প্রভাব কমে, ভোটার লিস্ট যেন

সঠিকভাবে হয় এবং যত দূর সম্ভব ভালো সৎ রাজনীতিবিদেরা নির্বাচিত হয় সেটুকু চেষ্টা। তারপর যেকুটু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার, রাজনৈতিক সংস্কার ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার হয় সে জন্য সোচ্চার হওয়া দরকার। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপর আমাদের কোনো আস্থা নেই। এ নির্বাচন কমিশন দিয়ে নিরপেক্ষ কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন করানো সম্ভব নয়। এ নির্বাচন কমিশন যে অর্থ ব্যয় করেছে ভোটার লিস্ট করার নামে সেটা অপব্যয় হয়েছে। এ জন্য উনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। আরেকটা কথা এখানে একজন বলেছে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তা তো বটেই। কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টই অবিশ্বাসের ফল। কেয়ারটেকার সরকার কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে কোনো শর্ত ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা নেই। যেকোনো লোককে ধরে নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা কমিশনার বানানো যেতে পারে। আমাদের যে ইতিহাস তাতে ২৫ বছর ধরেই সরকারি দল তার নিজস্ব লোককে যাদের প্রতি আস্থা আছে তাদের এ ধরনের পদে নিয়োগ দিচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। নির্বাচনের সময় ডেপুটি কমিশনার ইউএনও যারা নির্বাচনের সময় সংশিষ্ট কর্তকর্তা থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার পরই নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকে। তাদের বদলি করা যাবে না নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন ছাড়া। এটা শেষ হয়ে যায় নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৫ দিন পরই। কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তা যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে সে যেন পার না পেয়ে যায়। সে জন্য এ সময়টাকে এটাকে বড়ানোর প্রস্তাব আমরা করতে চাচ্ছি। আমাদের দেশে নির্বাচন একদিনে হয়। এটা কিন্তু খুব কঠিন। যদি একেক বিভাগে একেকদিন নির্বাচন হয়। ভারতে হয়েছে দেখেছি আমরা। একদিনে সব ফলাফল ঘোষণা করা। তাহলে বোধ হয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং যে ধরনের অনাচার এবং গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

হাবিব-উন-নবী খান সোহেল

মাঝেমধ্যে মনে হয় এ দেশে যা কিছু খারাপ সব রাজনীতিবিদেরা করেছেন। যা কিছু ভালো তা অন্যরা করেছে। আসলে কি তাই। সব রাজনীতিবিদই খারাপ। একজন রাজনীতিবিদ ভোর থেকে রাত ২টা-৩টা পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। মানুষের জন্য কাজ করেন। দু-চার-পাঁচ জনের ঢালাওভাবে সব দোষ সব দায়দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের ওপর দেওয়া ঠিক? এখানে সুশীল সমাজের কথা বলা হয়েছে। আসলে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সুশীল সমাজের কোনো পার্থক্য নেই। যারা দেশের রাজনীতি করেন দেশের ভালো চান। দেশের ভালোর জন্য সুশীল সমাজ কেন, যে সংগঠন এ ধরনের উদ্যোগ নেবে, আমি মনে করি সব সৎ রাজনীতিবিদই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সেই মানসিকতা নিয়েই সিপিডির আজকের এই আলোচনা সভায় আমি উপস্থিত হয়েছি। রাজনীতিবিদেরা জনগণের নেতৃত্ব দেন, মানুষ তাদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু প্রত্যাশা করে। করাটাই স্বাভাবিক। আজকে বাংলাদেশে পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন হচ্ছে। আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে এসেছি। পৃথিবীর বহু দেশ এ সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারেনি। তারপর দেখেন আমাদের দেশে একসময় নির্বাচন হতো। আশির দশকে দেখেছেন ব্যলট বাক্স ছিনতাই হতো। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাস্তানরা যেত ভোট ডাকাতির জন্য। এখন কি সে পরিবেশ আছে? সে পরিবেশ থেকে এখন আমরা অনেকটা ভালোর দিকে যাচ্ছি। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু মোটামুটি পজিটিভ ধারায় যাচ্ছি। সুতরাং এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কালো টাকার যে বিষয়টি এসেছে, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার যে বিষয়টি এসেছে আসলে আইন করে এসব বিষয়ে খুব একটা কিছু করা যাবে না। আমার মতে জনসচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই। আজকে সিপিডি যেভাবে ঘরের মধ্যে অনুষ্ঠান করছে আমরা আশা করব যে মানুষগুলো ভোট দেয় ভবিষ্যতে সিপিডি তাদের মধ্যে গিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান করবে। সব দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

অ্যাডভোকেট আ ই মো. সারওয়ার-উল-আলম

আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে আমার বিবেক বন্ধক রাখিনি। আমি যেটা উচিত মনে করি সেটা বলি। কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে আমার দায়বদ্ধতা নেই। তবে একটা শক্তির কাছে আমার দায়বদ্ধতা আছে। মুক্তিযুদ্ধের ধারক ও বাহক। আমাদের এ পবিত্র সংবিধান যখন রচনা করা হয় তখন প্রস্তাবনায় ছিল এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা অর্জন করা হয়। কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধ শব্দটাই এখন আর সংবিধানে নেই। যারা আজ পর্যন্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তার গাড়িতে আজকে পতাকা ওড়ে। এ লজ্জা জাতির লজ্জা।

আমি দুটো জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত দেব। একটি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা। একটি নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর দেশকে পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখে। যদি না তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা গৃহীত না হয়। যদি সে সরকার সাংবিধানিকভাবে বিতাড়িত না হয়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, যে মুহূর্তে নির্বাচন আসে সে মুহূর্তে সে সরকারকে আর বিশ্বাস করা যায় না। পাঁচ বছর যাকে নিয়ে ঘর করলাম আমরা, নির্বাচনের সময় তাকে আর বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় পৃথিবীর কাছে বিশ্বের কাছে আমরা একটা হাস্যকর উদাহরণ তৈরি করেছি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এ কনসেপ্ট বাতিল করা হোক। সংবিধানে আরেকটি ধারা আছে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী। আপনারা যে সরকারি আমলাদের বিতাড়নের

জন্য এতক্ষণ প্রস্তাব রাখলেন এই টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীরা আবার ফাঁকফোকর গলে ১০ জনের মধ্যে একজন মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। যেন একজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী না হলে আমার ওই তেলকল চলবে না, নাইকো গ্যাস ফ্যাক্টরি চলবে না। আমি টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী রাখার যে প্রস্তাবনা সংবিধানে আছে তা বাতিল করার প্রস্তাব রাখছি। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবেন না, এটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং আমি এও প্রস্তাব করছি আর্টিকেল ৭০-এ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকা উচিত। সংবিধানের এ তিনটি ধারা আমি মনে করি বাতিল হওয়া উচিত।

অধ্যাপক রেজা শাহ তৌফিকুর রহমান

দুঃখিনী বাংলাদেশের বিজ্ঞজনেরা আজকের এ সংকটকালে চুপ করে বসে নেই। তারা নিরন্তর চিন্তাভাবনা করছেন। এবং তাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে প্রকাশ করছেন। এ চেষ্টাটা আছে কেন? একটা ভালো সরকার উপহার দেওয়ার জন্য। একটা ভালো কিছু করার জন্য। সুশীল সমাজের বিজ্ঞজনেরা যারা এত সক্রিয় সে দেশে কখনো এত সংকট থাকতে পারে না। বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্য বলতে অনেকে ভালোবাসেন, বিশেষ করে যারা বাম রাজনীতি করেন। আমি শ্রেণীবৈষম্যই বলি। ধনী আরও ধনী হবে। দরিদ্র আরও দরিদ্র হবে। তার মানে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটা–আজকে প্রধানত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়েই আলোচনা হয়েছে–অর্থনৈতিক উন্নয়নটা করতে হবে এমন হারে যাতে করে একটা মধ্য পর্যায়ের দেশ হিসেবে আমরা পরিচিত হতে পারি। তার জন্য দরকার হলো একটা সরকার। আমি বলব আমাদের দরকার একটা সুশীল সরকার। গোটা দুনিয়ায় আজ গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতিবিদদেরই রাজনীতি করার কথা। সুশীলদের নয়। সেই রাজনীতিবিদেরা সুশীল হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা তাদের সহায়ক। আমরা যারা নিজেদের সুশীল বলে দাবি করছি আমরা তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে থাকতে চাই।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

* রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
* ছাত্র রাজনীতিকে সুসংহত করতে হবে এবং তার মূল ধারায় ফেরত আনতে হবে।
* আইনের মাধ্যমে নির্বাচিতদের সংসদে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
* শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে প্রার্থী হওয়া উচিত।
* পার্টিগুলোর এলাকাভিত্তিক কাউন্সিল প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, ঢাকা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় কমিটি নয়।
* দলীয় গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।
* স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নেতা নির্বাচন প্রতিহত করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সংস্কার

* ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রার্থী হতে পারবে না।
* প্রার্থী হতে দীর্ঘদিনের রাজনীতির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
* প্রার্থীর ন্যূনতম সচ্ছলতা থাকতে হবে।
* কালো টাকা কারা সাদা করেছেন এবং তাদের মধ্যে কারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন তা জনগণকে জানাতে হবে।
* একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ কতবার নির্বাচিত হতে পারবেন তা নির্ধারিত থাকা উচিত।
* শুধু রাজনীতিবিদদের নয়, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও সম্পদের হিসাব দিতে হবে।
* নির্বাচনে দাঁড়াতে প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার সাথে গভীর সম্পৃক্ততা থাকতে হবে অথবা ওই এলাকাবাসী হতে হবে।
* প্রার্থীর আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থী হবার যোগ্যতায় কোনো ভূমিকা রাখবে না।
* সরকারকে নির্বাচনী ব্যয়ভার বহন করতে হবে।
* মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই এমন কাউকে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।
* মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
* সকল প্রার্থীকে সম্পদের হিসাব দিতে হবে। হিসাবে গড়মিল পাওয়া গেলে তার দলীয় সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।
* প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করতে হবে।
* ইলেকশন কমিশনার হবার জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি থাকতে হবে।
* বর্তমান ইলেকশন কমিশনারের ব্যয়ের হিসাব নিতে হবে।
* ঋণখেলাপিরা প্রার্থী হতে পারবে না। তাদের ভোটাধিকারও খর্ব করতে হবে।
* এলাকাবাসী চাইলে পুনঃনির্বাচনের আবেদন করতে পারবে।
* চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীরা প্রার্থী হতে পারবে না।
* যোগ্যতার মাপকাঠির সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্যতার মাপকাঠি থাকা উচিত (যেমন- দলবদলের সংখ্যা, বিগত সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি)।
* দুর্নীতিপরায়ণতা, দেশের প্রতি আনুগত্য, দলীয় আনুগত্য, দলবদলের সংখ্যা, এলাকায় জনপ্রিয়তা, রাজনীতির অভিজ্ঞতা যাচাই করতে হবে।
* মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের নিম্ন বয়সসীমা ও সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

* সব নির্বাচন বিরোধসমূহ (Election Disputes) নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে সমাধা করতে হবে।
* নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জনবল নির্বাচনের পর অন্তত ছয় মাস নির্বাচন কমিশনারের অধীনস্ত থাকবে।
* বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, যাতে ব্যবস্থাপনা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।
* তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধুমাত্র নির্বাচন পরিচালনা ও অন্যান্য রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
* মন্ত্রিপরিষদ ছোট করা প্রয়োজন।

* 'ফিঙ্গার প্রিন্ট'ভিত্তিক ভোটার লিস্ট ও ভোটিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
* তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। তাই কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা উচিত নয়।
* আর্টিকেল ৭০-এ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
* কোনো সাংসদ সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তার ওইদিনের বেতন-ভাতা কেটে নেওয়া প্রয়োজন।
* কোনো টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকা উচিত না।

সুশীল সমাজ ও সিপিডি-র ভূমিকা

* নাগরিক কমিটির উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসে সমস্ত বাংলাদেশের মতামত তুলে ধরা।
* সিপিডি-র উচিত এই সংলাপের মাধ্যমে বিরোধী দল ও সরকারকে আলোচনায় বসানোর উদ্যোগ নেওয়া।
* এলাকাভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন করা উচিত যারা প্রার্থীদের অতীত কর্মকাণ্ড তুলে ধরবে।
* নাগরিক কমিটিতে ক্ষেতমজুর, কৃষক থাকা উচিত। শুধুমাত্র 'এলিট' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি কমিটিকে অকার্যকর করে তুলবে।
* নাগরিক কমিটির কর্মসূচি নির্বাচনের পরেও চালিয়ে যেতে হবে।
* কোনো প্রার্থী যদি সঠিক তথ্য প্রকাশ না করে, তা হলে সুশীল সমাজের উচিত তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা।
* নাগরিক কমিটিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্রুত আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্থনীতি ও অন্যান্য

* রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত।
* নির্বাচিত সদস্যরা বিগত পাঁচ বছরে কী করেছেন তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
* স্থানীয় পরিষদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
* স্থানীয় সম্পদের স্থানীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
* শুধুমাত্র কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কারণে সব রাজনীতিবিদকে দোষারোপ না করে, ভালো রাজনীতিবিদদের প্রশংসার মাধ্যমে সুষ্ঠ রাজনীতিবিদদের উৎসাহিত করতে হবে।
* সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকেরই দায়িত্ব (শুধু রাজনীতিবিদেরা নয়) তার নিজ নিজ সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হওয়া।
* সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের।
* 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' (ADP)-র থোক বরাদ্দ (Block allocation) যেন নির্বাচনে ব্যয় না হয়, তার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে।